দুই নম্বরি

লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

গরমে জীবন বিপর্যস্ত। এসি'র দামও নাগালের মধ্যে। ইচ্ছে করলে একটি এসি কেনা যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ বিলের আতঙ্কে এসি কেনার কথা ভাবতে পারছেন না খালেক সাহেব। খালেক সাহেবের সাহায্যে এগিয়ে এলেন এলাকার মিটার রিডার। দেখালেন 'দুই নম্বরি' পথ। খালেক সাহেব কিনে ফেললেন একটি এসি। রাস্তার বিদ্যুৎ খুঁটি থেকে তার দিয়ে সরাসরি একটি লাইন টেনে নিয়েছেন। যে তারের সঙ্গে মিটারের কোনো সংযোগ নেই। এর জন্যে প্রতিমাসে মিটার রিডারকে দিতে হয় তিনশ' পঞ্চাশ টাকা। বিল বাবদ আর কোনো খরচ নেই। অথচ একটি এসি বাবদ প্রতিমাসে বিল আসার কথা ছিল এক থেকে দেড় হাজার টাকা। এই টাকা থেকে বঞ্চিত হলো বিদ্যুৎ বিভাগ, সরকার, দেশের জনগণ। এই অর্থের একটা অংশ চলে গেলো একজন ব্যক্তির পকেটে। তার থেকে চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগের নিম্ন-উচ্চ সব পদস্থ কর্মকর্তাদের পকেটে।

এই 'দুই নম্বরি' এখন আমাদের যাপিত জীবনের অঙ্গ। আমরা প্রায় প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে 'দুই নম্বরি' কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দুই নম্বরি কর্মকান্ড আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আমরা এর থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। মুক্তি সম্ভবত চাইছিও না। আবার অনেক সময় না চাইলেও কোনো না কোনোভাবে দুই নম্বরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হচ্ছে। নিজের সততা দিয়েও এর হাত থেকে মুক্তি নেই।

একজন সৎ মানুষের গল্প বলি। তিনি ট্রেনে নিয়মিত যাতায়াত করেন। প্রায় অধিকাংশ সময় তাকে টিকিট কিনতে হয় ব্ল্যাকে। নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বেশি দিয়ে। ব্ল্যাকারদের থেকে কমিশন খেয়ে রেলকর্মকর্তারা টিকিট বিক্রি করে দুই নম্বরি পথে। ব্ল্যাকারদের থেকে টিকিট কেনাটা কী দুই নম্বরি নয়? এটাও দুই নম্বরি। দুই নম্বরি এই কারণে যে, ব্ল্যাকারদের থেকে বেশি মূল্যে টিকিট কিনে এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে টিকিয়ে রাখছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। প্রশ্ন আসে তিনি ব্ল্যাকারদের থেকে টিকিট না কিনে কি করতে পারেন? প্রতিবাদ করতে পারেন। টিকিট না কিনতে পারেন। কিন্তু তাতে লাভটা কী হবে? তার স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হবে। তার মানে আপনি নিজে সৎ হলেও দুই নম্বরি প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনি ঠিকই সম্পৃক্ত।

দুই নম্বরি কর্মকান্ড দেখতে গেলাম মিরপুরের বিআরটিএ অফিসে। বাংলাদেশের এই একটি অফিস যেখানকার চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত ঘুষ খায়। পুরো অফিসকেই বলা যায় দুই নম্বর। আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে চান? আপনার ড্রাইভিং জানতে হবে না। খরচ করতে হবে তিনশ' থেকে এক হাজার টাকা। পেয়ে যাবেন দুই নম্বরি লাইসেন্স। কোনো রকমে গাড়ি চালানো শিখেও আপনি সেই লাইসেন্স দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। আর যদি আপনি ড্রাইভিং শিখে, বৈধ উপায়ে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স পেতে চান, তাহলে কী করতে হবে? করতে হবে অনেক কিছু। তবে এটা

'আমি পজিট্রনে কখনই কোচিং করিনি। তাদের সঙ্গে আমার কখনই কোনো যোগাযোগ ছিলো না। ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করার পর পজিট্রন কোচিং সেন্টার সংবর্ধনা দেয়ার কথা বলে চিঠি দেয়, ফোন করে। বারবার ফোন করে, গাড়ি পাঠিয়ে বলতে পারেন কিডন্যাপ করার মতো করে আমাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়, ছবি তোলে..'

একটি প্রায় অসম্ভব প্রক্রিয়া। আপনাকে ঘুরতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ধরে নিলাম এভাবে আপনি একটি লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়। তারপরও অনেক কথা আছে। রাস্তায় সার্জেন্ট আপনার গাড়ি ধরবে। লাইসেন্স নিয়ে নেবে। দুই নম্বরি লাইসেন্স হলে পঞ্চাশ থেকে দুইশ' টাকার বিনিময়ে লাইসেন্স ফিরিয়ে দেবে। এক নম্বর লাইসেন্স হলে পাঁচশ' টাকার কমে ফেরত পাবেন না। কারণ সার্জেন্ট খুব ভালো করেই জানে এই লাইসেন্সটি পাওয়ার জন্য আপনাকে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে!

লাইসেন্সের মতো গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য একই কথা। শুধু অর্থের বিনিময়ে গাড়ি না দেখেই আপনাকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে আমাদের বিআরটিএ'র সুযোগ্য কর্মকর্তারা। আপনি যদি দুই নম্বর কিছু মানুষকে কাছে থেকে দেখতে চান তাহলে কষ্ট করে একবার বিআরটিএ অফিসে যান। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল দুই নম্বর মানুষ আপনাকে ঘিরে ধরবে। কর্মকর্তাদের দুই নম্বরি দেখার জন্যে আপনাকে অফিসের ভেতরে ঢুকতে হবে। দেখবেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে চলছে দুই নম্বরি। অথচ দেশের জনগণ তাদের বেতন দিয়ে রেখেছে।

আপনার গাড়ির ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওয়ার্কশপে নিয়ে যাবেন। সেখানে গিয়ে দেখবেন দুই নম্বরি জিনিসের ছড়াছড়ি। অর্থ দিলে অন্যের গাড়ির যন্ত্রপাতি খুলে আপনার গাড়িতে লাগিয়ে দেবে। একইভাবে আপনার ভালো গাড়ির যন্ত্রপাতি খুলে নিয়েও অন্যের গাড়িতে লাগিয়ে দেয়া হতে পারে। এমনটা করা হয়েছে কী হয়নি একবার গাড়ি ওয়ার্কশপে নেয়ার পর- এই সন্দেহ আপনার মনে স্থায়ী আসন করে নেবে।

'মেড ইন জিনজিরা' দুই নম্বরি বোঝানোর সবচেয়ে উপযোগী বাক্য। চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর- প্রভৃতি দেশের তৈরি ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের হুবহু কপি পাবেন জিনজিরায় গেলে। এগুলো তৈরি করছেন আমাদের কারিগররা। কপি করাটা খারাপ নয়। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে একটা দুই নম্বরি রয়েছে, তাই জিনজিরায় তৈরি জিনিস মানুষ কিনছে না জেনে, না বুঝে। এই প্রতারণা চলছে প্রতিনিয়ত। ধোলাই খাল সম্পর্কে বলা হয় যে কোনো যন্ত্রাংশ (বিশেষ করে গাড়ির) তাদের দেখালে তারা হুবহু সেরকম আর একটা যন্ত্রাংশ বানিয়ে দিতে পারে। এটা শুধু গল্প নয়, পুরোপুরি সত্যি। ধোলাই খালের এই 'দুই নম্বরি' যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভর করেই আমাদের পরিবহন সেক্টর অনেকটা টিকে আছে। ইচ্ছে করলে জিনজিরা এবং ধোলাই খালকে বিশাল বড় শিল্পে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো সরকারই ধোলাই খালের কারিগরদের বিষয়ে অতীতে কখনো আগ্রহ দেখায়নি। বর্তমানেও দেখাচ্ছে না। ভবিষ্যতেও দেখাবে এমনটা বিশ্বাস করাও কঠিন। ফলে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে 'দুই নম্বরি' ইমেজ নিয়েই সমাজে টিকে থাকতে হবে।

লালবাগ, আলুবাজার, সিদ্দিকবাজার, বেগমবাজার, চকবাজার... পুরনো ঢাকার এই অঞ্চলগুলো দুই নম্বরি কাজের জন্য বিখ্যাত। কোক-পেপসির ফর্মুলা জানে পৃথিবীর মাত্র দু'তিন জন মানুষ। সেই কোক-পেপসিও দুই নম্বরি তৈরি করেছিলেন লালবাগের একজন গডফাদার-রাজনীতিবিদ। প্যানটেন, হেড অ্যান্ড সোল্ডারসহ সুখ্যাত এই শ্যাম্পু তৈরি হয় এই এলাকায়। পৃথিবীখ্যাত পারফিউম, লিপস্টিক, নেইল পলিস, ফেয়ার এন্ড লাভলি সবকিছুই তারা তৈরি করে। এই দুই নম্বরি জিনিসগুলো তৈরি হয় পুরনো ঢাকায়, গোপনে। পাইকারি বিক্রি হয় চকবাজারে, খুচরা বিক্রি হয় গুলিস্তানে- প্রকাশ্যে। চকবাজারের অনেক দোকানদার গর্ব করে বলে, 'আমার দোকানে কোনো এক নম্বর জিনিস নেই, সব দুই নম্বর।'

এই দুই নম্বর জিনিস অল্পদামে কিনে ব্যবহার করছেন দেশের মানুষ, শরীরের জন্য ক্ষতিকর জেনেও।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা 'দুই নম্বরি'তে জর্জরিত। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বড় দুই নম্বরি করছে কোচিং সেন্টারগুলো। তারা ছাত্রছাত্রীদের থেকে অর্থ নিয়ে প্রতারণা করছে। আবার অনেক সময় সামান্য অর্থ দিয়েও প্রতারণা করছে। এটা বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সায়লা সোয়াত সিদ্দিকী। এইচএসসি পাস করেছেন ঢাকা সিটি কলেজ থেকে। কোচিং করেছেন 'ঢাকা কোচিং'-এ। ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে। তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে 'দুই নম্বরি'। দুই নম্বরি করছে 'পজিট্রন' নামক আর একটি কোচিং সেন্টার। তারা সায়লা সোয়াত সিদ্দিকীর ছবি ছেপে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। দাবি করছে সায়লা শুধু পজিট্রনেই কোচিং করেছে। অর্থাৎ একজনকে নিয়ে 'শুধুমাত্র' দাবি করছে দুটি কোচিং সেন্টার। সেটা কি করে সম্ভব? আমরা কথা বলেছি সায়লা সোয়াত সিদ্দিকীর সঙ্গে। তার বক্তব্য শুনুন, 'আমি পজিট্রনে কখনই কোচিং করিনি। তাদের সঙ্গে আমার কখনই কোনো যোগাযোগ ছিলো না। ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করার পর পজিট্রন কোচিং সেন্টার সংবর্ধনা দেয়ার কথা বলে চিঠি দেয়, ফোন করে। বারবার ফোন করে, গাড়ি পাঠিয়ে বলতে পারেন কিডন্যাপ করার মতো করে আমাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়, ছবি তোলে। প্রতিমাসে পাঁচশ' টাকা করে বৃত্তি দেয়ার ঘোষণা দেয়। দু'বছর তারা এই টাকা দেবে বলে জানায়। আর এখন পজিট্রন সেই ছবি দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন করছে। আমরা আসলে পজিট্রনের ফাঁদে পড়ে গেছি।'

পজিট্রনের এরকম দুই নম্বরির শিকার আর একজন ছাত্রীর সঙ্গেও কথা হয় আমাদের। সে কোনো কথা বলতে রাজি নয়। কারণ তাকে ভয় দেখানো হয়েছে এই বলে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে পত্রিকায় অনেক কিছু লিখে দেয়া হবে। এই ছাত্রী জেনেছে পজিট্রন কোচিং সেন্টারের নাকি একটি সিনে পত্রিকা আছে। পজিট্রন কোচিং সেন্টারের পরিচালক মাযহারুল ইসলাম নামক এক ব্যক্তি। তিনি আবার 'অন্যদিন' নামক একটি সিনে পত্রিকারও সম্পাদক।

সায়লা সোয়াত সিদ্দিকীরা মেধাবী ছাত্রী। ভালো কলেজে পড়াশোনা করেছে। ভালো রেজাল্ট করেছে। ভর্তি হতে পেরেছে ফিনান্সে। এর জন্যে কৃতিত্ব কার? কোচিং সেন্টারের? সায়লার নিজের, কলেজের শিক্ষকদের কোনো অবদান নেই? বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় এই কৃতিত্ব শুধুই কোচিং সেন্টারের। অথচ কোচিং সেন্টারগুলো বিজ্ঞাপন দিয়ে দুই নম্বরি করছে প্রকাশ্যে। তাদের নিয়ন্ত্রণের বা দেখার যেন কেউ নেই। শুধু পজিট্রন নয়, সবগুলো কোচিং সেন্টারই

মিগ-২৯ কিনে শেখ হাসিনা, এয়ারবাস কিনে খালেদা জিয়া, আলোচিত হয়েছেন। উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন দুই নম্বরি জিনিস কেনার, কমিশন খাওয়ার। জিয়াউর রহমানের সময়ে ওবায়দুর রহমান প্রায় খেলনা সাইজের দুই নম্বরি রেল ইঞ্জিন কিনে আলোচিত হয়েছিলেন। তবে রাজনীতিবিদদের সব রকম দুই নম্বরিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এরশাদ। তার সময়ে মেঘনা ব্রিজ আকারে ছোট করে তৈরি করা হয়েছিল

দুই নম্বরি করছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে একাধিক কোচিং সেন্টার নিজেদের বলে দাবি করছে। তাদের ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন করছে। সায়লা সোয়াত সিদ্দিকীর ক্ষেত্রে যেমনটা করা হয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীরাও সামান্য অর্থ-পুরস্কারের লোভে পড়ে যাচ্ছেন। অভিভাবক-রাও সচেতন হচ্ছেন না। দুই বছরে কোচিং সেন্টারের প্রতিশ্রুত বারো হাজার টাকায় তারা

একজন জাপানির সঙ্গে কথা হয়েছিল টোকিওতে। তিনি বাংলাদেশের একটি হাসপাতালকে কিছু আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি দান করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য সেই হাসপাতালটির রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন ছিল এনজিও ব্যুরোর। তিনি বাংলাদেশ এসেছিলেন এবং এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তাদের কাছে গিয়েছিলেনও। এনজিও ব্যুরো থেকে এই জাপানিজের কাছে এক হাজার ডলার ঘুষ চাওয়া হয়েছিল

চুপ করে দুই নম্বরি মেনে নিচ্ছেন।

প্রাথমিক থেকে উচ্চ- সব শিক্ষকরাই জড়িয়ে পড়েছেন 'দুই নম্বরি' কর্মকান্ডে। সব শিক্ষক না হলেও প্রায় সব শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন আছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নৈতিকতা শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। তারা নিজেদের কনসালটেন্সির মিটিংয়ের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন ঠিক করে। কনসালটেন্সি করাটা খারাপ বলছি না। বলছি দায়বদ্ধতার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কারণেই তিনি কনসালটেন্সি পেয়ে থাকেন। তাই ছাত্রদের পড়ানোটাই তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, অধিকাংশ শিক্ষকই ক্লাসে অনুপস্থিত থেকে কনসালটেন্সি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ক্লাস না নিয়ে নর্থ সাউথে গিয়ে ক্লাস নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস না নিলে তাকে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু নর্থ সাউথের ক্লাস না নিলে তিনি মোটা অর্থ থেকে বঞ্চিত হবেন।

ইদানীং পরিচিত বেশ কিছু শিক্ষককে দেখি তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ক্লাস নেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা বা আলোচনা করতেও শুনি না।

দুই নম্বরি চলছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও। ডাক্তাররা হাসপাতালে রোগী দেখতে বা অপারেশন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তারা বেসরকারি ক্লিনিকের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। অভিযোগ আছে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সংখ্যক টেস্ট দিয়ে তাদের পরিচিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠান। রোগীর সামর্থ্য আছে কিনা সেটা তারা দেখেন না। গ্রাম থেকে আসা রোগীর জমি বিক্রি করা টাকা নিজের পকেটে নেন কোটিপতি ডাক্তার। 'দুই নম্বরি' শব্দ দিয়ে কী এই অনৈতিকতা, অমানবিকতাকে বোঝানো যায়?

মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুই নম্বরি করছেন রাজনীতিবিদ-আমলারা। রাজনীতি-বিদরা জনগণকে যে সব প্রতিশ্রুতি দেন তার প্রায় সবই দুই নম্বরি। তারা জনগণ এবং দেশের কথা বলে কাজ করেছেন নিজের জন্য। বিমান, ফ্রিগেট কেনেন নিজেদের কমিশনের জন্য। কমিশন বেশি পাওয়ার কারণে কেনেন দুই নম্বরি বিমান, জাহাজ। মিগ-২৯ কিনে শেখ হাসিনা, এয়ারবাস কিনে খালেদা জিয়া, আলোচিত হয়েছেন। উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন দুই নম্বরি জিনিস কেনার, কমিশন খাওয়ার। জিয়াউর রহমানের সময়ে ওবায়দুর রহমান প্রায় খেলনা সাইজের দুই নম্বরি রেল ইঞ্জিন কিনে আলোচিত হয়েছিলেন। তবে রাজনীতিবিদদের সব রকম দুই নম্বরিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এরশাদ। তার সময়ে মেঘনা ব্রিজ আকারে ছোট করে তৈরি করা হয়েছিল। রাজনীতিবিদদের দুই নম্বরির কারণেই সন্ত্রাসী ডিপজল জমি পেয়ে যায় সিএনজি স্টেশন করার। প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিনের এই দুই নম্বরির কথা আবার এমপি এস.এ খালেক সংসদে ফাঁস করে দেন। কিন্তু তাতে কারো কিছু যায় আসে না।

জনগণের সুবিধার কথা বলে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু করে বাংলাদেশ বিমান কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এই ফ্লাইটটি চালু করেছিল আমলারা। কারণ তাদের সন্তানরা আমেরিকায় পড়াশোনা করেন। আর আমলারা ফ্রি বিমান টিকিট পান। এরকম অসংখ্য দুই নম্বরি কর্মকান্ড আমলাদের হাত দিয়ে সংঘটিত হয়। এখানে লেখা হলো একটি মাত্র।

একজন জাপানির সঙ্গে কথা হয়েছিল টোকিওতে। তিনি বাংলাদেশের একটি হাসপাতালকে কিছু আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি দান করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য সেই হাসপাতালটির রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন ছিল এনজিও ব্যুরোর। তিনি বাংলাদেশ এসেছিলেন এবং এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তাদের কাছে গিয়েছিলেনও। এনজিও ব্যুরো থেকে এই জাপানিজের কাছে এক হাজার ডলার ঘুষ চাওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই ডলার দিতে রাজি হননি। ফলে রেজিস্ট্রেশনও হয়নি। জাপানিজের সেই যন্ত্র গ্রহণও করতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এমন দুই নম্বরি কাজের নজির পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে।

পত্রিকা-সাংবাদিকরাও দুই নম্বরি কর্মকান্ডের বাইরে নয়। পাঁচ ছয়টি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ পত্রিকার মালিকরাই আঞ্চলিক সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দেন না। ধরিয়ে দেন একটি পরিচয়পত্র। সেটা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে দুই নম্বরি কর্মকান্ডের হাতিয়ার। দুর্নীতিগ্রস্ত 'দুই নম্বরি' ডিসি-এসপিরাও তাদের ভয়ে আতঙ্কে থাকেন।

ইঞ্জিনিয়ারদের দুই নম্বরির কারণে বিল্ডিং, ব্রিজ ভেঙে পড়ে, ফুটওভার ব্রিজের গার্ডার ভেঙে পড়ে মারা যায় মানুষ।

আপনি টিএন্ডটি'র একটি টেলিফোন পেতে চান বৈধভাবে? টিএন্ডটির টেলিফোন, তাও আবার বৈধভাবে? তাহলেই হয়েছে। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে প্রায় মৃত্যু পর্যন্ত। অতি দ্রুত পাওয়ার নিয়মও আছে। নিয়মটা কি? সেই 'দুই নম্বরি'। টেলিফোন যারা পায়, দুই নম্বরি উপায়েই পায়।

পৃথিবীর বিখ্যাত কোম্পানির হুইস্কি বাংলাদেশে তৈরি হয় দুই নম্বরি উপায়ে। সুতরাং মদও এক নম্বর খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। আম, লিচু সবকিছুর মধ্যে ঢুকে গেছে দুই নম্বরি। ক্ষতিকারক কেমিক্যাল ব্যবহার করে আম, লিচুর রঙ আকর্ষণীয় করা হচ্ছে। সেটা মানুষ কিনছে। রাজনীতিবিদরা ভারতীয় পচা গম কিনে দেশী গম হিসেবে গুদামজাত করছে রাজনীতিবিদরা। কেরোসিন তেলকে বিমানের জ্বালানি হিসেবে চালানোর চেষ্টাও হয় এদেশে। ব্যবসায়ীরা চিংড়ির মধ্যে লোহা ঢুকিয়ে রপ্তানি করছেন বিদেশে।

আসলে দুই নম্বরিকে আমরা সহজভাবে মেনে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি এর থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এই পরিত্রাণের আশাও করি না। তবে সবাই এই দুই নম্বরি করতে অভ্যস্ত নয়, পারেও না। যেমন আমাদের কৃষক। তারা তিন হাজার টাকা লোন নিয়ে শাস্তি পায়, দুই নম্বরি জানে না বলে। সালমান রহমানরা কয়েকশ' কোটি টাকা ঋণ নিয়ে দাপটের সঙ্গে টিকে থাকে, দুই নম্বরি জানে বলে। এটা আমাদের একবিংশ শতাব্দীর সমাজ চিত্র।